চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার, ক্ষমতায়ন, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি-(তৃতীয় কিস্তি)

রবিউল ইসলাম

খ) মোল্লাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, সমিতি বা এন্‌জিওর নামে বেপর্দা মহিলারা বেগানা পুরুষের সাথে বেশরীয়তি মেলামেশা করে এবং স্বামীর অবাধ্য(মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ-ইসলামে সমর্থন নেই) হয় এই অজুহাতে সবসময় উন্নয়নের বিরোধিতা করছেন, দেশের অর্ধেক শক্তিকে আপনারা অকেজো করে দেশকে পিছিয়ে রাখছেন, কিন্তু কথিত চোদ্দগ্রামের ঐ সিদ্দিকদের মতো অভাবগ্রস্থ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পিতাদের অসহায় কন্যারা বা স্ত্রীরা যদি পিতা বা স্বামীর অভাবের কারণে শহরে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায়, তবে সেটা কী শরীয়তসম্মত হবে নাকি ইসলামসম্মত হবে ? কোন্ ইসলাম ? বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে সিদ্দিকের মতো হাজারো অসহায় পিতা, কখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া মেয়েকে অর্থকষ্টের কারণে যৌতুকের দাবী মিটিয়ে সময়মতো বিয়ে না দিতে পারার ফলে, আবার কখনো কন্যাটিকে লেখাপড়া শেখানোর অপরাধে, অথবা তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার অপরাধে সমাজের কাছে নানাধরণের কটূকথা ও মানসিক গঞ্জনার শিকার হন যার যার উৎস হলো মৌলানা-মৌলবীদের অশুভ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রচার। সামান্যতম মানবতাবোধ এদের মধ্যে নেই।

এখানে হয়তো আপত্তি উঠতে পারে এই বলে যে, কুমিল্লার একটি গ্রামের(নারচর) ঘটনা দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামের(ও শহরের) মোল্লাদের বিচার করা যায় না-নারচরের ঘটনা একটি বিচ্ছন্ন ঘটনা। তাই কি ? লক্ষ্য করতে হবে যে, কথিত মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে গ্রামের কোন একক মোল্লা পেছনে লাগেননি। লেগেছিল গ্রামের পুরো মোল্লাসমাজ। একজন ব্যক্তিমোল্লা আর মোল্লাতন্ত্র এক ব্যাপার নয়। অর্থাৎ, মোল্লাতন্ত্র গড়ে উঠে সম্মিলিতভাবে তাদের গ্রাম শাসনের স্থানীয়ভাবে প্রভাব বা ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে। একজন মৌলবির ব্যক্তিগত বিরোধিতা একজিনিস আর জোতদার-মহাজনদের সাথে মিলে প্রভাব বিস্তার করা ভিন্ন জিনিস। আর এভাবে দেখলে, বাংলাদেশের অগণিত গ্রামেই মোল্লাতন্ত্রের উপস্থিতি দেখা যাবে। বহু গ্রামেই, যেখানেই গ্রাম্য যৌথ খামার বা সমিতি অথবা এনজিওর কার্যক্রম(শিক্ষামূলক, বিনিয়োগভিত্তিক, স্বাস্থ্যভিত্তিক ইত্যাদি) দেখা গেছে, প্রায় সব জায়গাতেই স্থানীয় মোল্লারা বাধা দিয়েছে এবং তাদের শহুরে কমরেডরা বা সহযোগিরা তাতে উৎসাহ ও মদদ জুগিয়েছেন। অর্থাৎ সবসময়ই তাঁরা জাতির উন্নয়নের বিরুদ্ধে, প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের এত বিদ্বেষ, ভারতই নাকি পাকা ধানে মই দিচ্ছে, আপনারাই বলুন, দেশের অর্ধেক শক্তি নারীকে ঘরে আবদ্ধ রেখে আমরা কিভাবে ভারতের সংগে পাল্লা দেব ? যে পাকিস্তান একসময় সবকিছুতে ভারতের সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করতো, আজ কেন এত পিছিয়ে পড়ল, ভারত কিভাবে এত সামনে এগিয়ে গেল-একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্নপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো, তা আমাদের ভাবতে হবে বৈকি। তাঁরা মানব-সম্পদ উন্নয়ন ঘটাচ্ছে গুরুত্বের সাথে, মানবদক্ষতা কাজে লাগাচ্ছে। তাদের নারী প্রোগ্রামার, নারী প্রকৌশলী, নারী চিকিৎসক প্রভৃতি পেশাজীবীরা ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি ভারতের নারী মহাকাশবিজ্ঞানী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা ও অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করছে। প্রিয় পাঠক, শুধু অন্যকে গালি দিয়ে, নিজেদের দোষগুলির ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে

রেখে আমরা কোনদিন এগোতে পারবনা ।

গ) ইসলামের ধ্বজাধারীরা কি জানেন যে, শহরে কর্মরত গৃহপরিচারিকা(যাদের অনেককেই গৃহস্বামীদের লালসা পূরণ করতে হয় বাধ্য হয়-(পেটের জ্বালা বড় দায়, গার্মেন্টস শ্রমিক, ইটভাঙ্গা নারী শ্রমিক ইত্যাদির এক বড় অংশেরই গ্রামে স্বামী রয়েছে) ? তাঁদের অনেককেই জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে, টিকে থাকতে গিয়ে, অথবা শহরের বস্তিতে সস্তা ভাড়ার নিমিত্তে একাধিক পুরুষের থাবা থেকে বাঁচার জন্য(অর্থাৎ, প্রটেকশন হিসেবে) সাইনবোর্ড হিসেবে(দ্বিতীয়) একজন পাতানো স্বামী নিয়ে লিভ টুগেদার করতে বাধ্য হয় ? এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়, বহু দিন থেকেই চলে আসছে । মোল্লারা ত' গ্রামে আধা সামন্ত শ্রেণীর এবং শহরে লুটেরা ব্যবসায়ীদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে আরাম-আয়েশে থাকেন, হারাম-হালালের বাছবিচার না করে, তাঁদের এসব অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয় । 'উচ্ছিষ্ঠভোগের' ব্যাপারটি ঈষৎ ব্যাখ্যা না দিলে পাঠক হয়তো আমার উপর বিক্ষুব্ধ হবেন এই ভেবে যে আমি মনগড়া বক্তব্য চালিয়ে দিচ্ছি । অভিজ্ঞরা জানতে পারেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরে এত অসংখ্য মসজিদ স্থাপনের পেছনের রহস্যটা কি ? না, পরলৌকিক কোন লাভের জন্য নয়, স্রেফ জাগতিক-ইহলৌকিক কারণেই ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে এত মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে । মসজিদকে কেন্দ্র করে যে শপিং সেন্টার গড়ে উঠে, তার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে রীতিমতো কামড়াকামড়ি-টেন্ডারবাজি শুরু হয় বৈধ-অবৈধ সমস্ত উপায়ে । এইসব লুণ্ঠন ও চাঁদাবাজির একটা অংশ আল্লার নামে দান করা হয় মোল্লাদের বিভিন্ন ফান্ডে, তাতে নাকি সব হালাল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাঁদা নিয়ে গঠিত ফান্ড আত্নসাৎ করে কীভাবে ইনকিলাবের মওলানা মান্নান নিজের ব্যবসায় কাজে লাগিয়েছেন, সেসব ঘটনা আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম । আজ, যেসব ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ করছে, সে মোল্লারাই কিন্তু একসময়ের খুনি ও প্রতারক মৌলানা মান্নানের স্মৃতিচারণ-সভায় বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় হরহামেশা বলে থাকেন, যে মৌলানা মান্নানের জীবন, ইসলামের সেবায় তাঁর 'আপোষহীন' সংগ্রাম(বিশেষ করে আ.লীগ ও বি.এন.পি. সরকারের সঙ্গে) নাকি তাদের জন্য পাথেয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ! বক্তব্যগুলি হুবহু এরকম না হলেও মূলকথাটা তাই ছিল । এখন, প্রশ্ন হলো, মৌলানা মান্নানের কোন্ আদর্শটিকে এই মোল্লারা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত মনে করছেন ? চাঁদাবাজি ও প্রতারণা(যার উদাহরণ উপরে দেয়া হয়েছে) ? নাকি একাত্তরের সময় বুদ্ধিজীবি হত্যা ? প্রিয় পাঠক, আজ এই একই গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে তথাকথিত ইসলাম রক্ষার নামে । এই গোষ্ঠীই ৫২র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১এর স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা করে এসেছে । ইতিহাস সাক্ষী, চিরকালই এরা জাতীয় প্রগতির বিরুদ্ধে, গণমানুষের গণতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং কায়েমীস্বার্থের পক্ষে অর্থাৎ এষ্টাব্লিশমেন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ।

তো, কথা হচ্ছিল, গ্রাম থেকে আসা বস্তিবাসী ছিন্নমূল নারী-পুরুষ শ্রমিকদের লিভ-টুগেদার নিয়ে । ফতোয়াবাজদের কাছে প্রশ্ন, স্বামীর অজান্তে অথবা অবিবাহিত নারীশ্রমিকদের এই যে লিভ টুগেদার- এটাওতো বেশরিয়তি কাজ, পারবেন কি এটা বন্ধ করতে ? তা হলে তো গ্রাম থেকে মহাজনী শোষণ এবং কৃষিতে পূজিবাদ তথা গ্রাম্য বাজারব্যবস্থায় বিবিধ উদারীকরণের ফলে সৃষ্ট মেরুকরনের কারণে নিস্বীকরনের শিকার নারীপুরুষের শহরমুখি স্রোতকে বন্ধ করতে হবে(যার অনেকটা দায়দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তায় ?)। না আপনারা সেটা পারবেন না, কারণ এরই নাম হচ্ছ সমাজবিবর্তন, সমাজ বাস্তবতা-যা সমাজ বিকাশের ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম, যা আপনাদের জন্য দুর্বোধ্য । ১৪০০ বছর আগের আরবের সমাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো আর শিল্পবিপ্লবোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর

এখনকার তৃতীয় বিশ্বের গরীব মুসলিম দেশগুলোর শতধা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। আরবে তখন এত শত শত বস্তি ছিল না। তো কথা সেটা নয়, প্রশ্ন হলো নারীদের উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী কি শুধু মহাজনী ও গ্রামীন পুজিবাদী শোষন ? অবশ্যই নয়, মোল্লাতন্ত্রও অনেকাংশে দায়ী।

ঘ) এখন, শহরের মোল্লারা মাঝেমধ্যেই পূণ্যলোভে হুংকার ছাড়েন পতিতালয়গুলো বন্ধ করে দেবেন। আমার বিনীত প্রশ্ন, এটা করার নৈতিক অধিকার তাদের রয়েছে কি ? বাংলাদেশে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে
(অবশ্য জামাতি এনজিওগুলো মাফ) প্রথম থেকেই প্রতিরোধ ও বিরোধিতার মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে গ্রাম ও শহরের মোল্লারা কি একযোগেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে না ? বাধ্য করছে না হাজার হাজার প্রান্তিক শ্রেণীর নারীকে উদ্বাস্তু হতে। তবে কোন অধিকারে ভাগ্যাহত এইসব পতিতার জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদেরকে উচ্ছেদ(পতিতালয় থেকে) করার জন্য অমানবিক বর্বর হামলা চালানো হয় ? তাঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার মুরোদ কি এদের আছে ? এটা কি শুধু সরকারের কাজ ? ভদ্রলোকদের মত না হোক, কোনরকমে পেটেভাতে খেয়েপরে বেঁচে থাকা তো তাদের অধিকার। আপনারা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হতে দেবেন না, আবার এদিকে পতিতাবৃত্তিও করতে দেবেন না, তবে তারা যাবে কোথায়-আত্মহত্যা করবে ? সে পথও তো আপনারা আপ্তবাক্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। উপরে বর্ণিত এইসব গ্লানিকর জীবনের পরিণতি ও ঘটনা হয়তো অনেক কম হতো যদি নারীরা সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের আইনগত প্রটেক্শন পেতো।

৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(১৯৩৯-১৯৪৫) পূর্বে ও তারপরও বহুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলোর কাঠামো ছিল প্রধানত একান্নবর্তী ধরণের এবং মূল্যবোধ ছিল রক্ষণশীল তথা মধ্যযুগীয় ধাঁচের, এটা আমরা মোটামুটি অনেকেই জানি। তখন হিন্দু-মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে নারীদের কঠোর পর্দার মধ্যে রাখা হতো। মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা ইংরেজি শিক্ষা দুরে থাকুক, বাংলা শিক্ষাও নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় বিধানের নামে। শুধুমাত্র ফারসী ভাষায় সীমিত কিছু ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেতো। বেগম রোকেয়ার পারিবারিক জীবন এবং ভাইয়ের সাহায্য-অনুপ্রেরণায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের বেলা বিদ্যাচর্চা করার কাহিনী আমরা সবাই জানি। হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারগুলোতেও নারীদের একই অবস্থা ছিল। তো একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে নারীদের যখন এই অবস্থা চলছিল, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে কালোবাজারী, মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলো এবং বহু দিন স্থায়ী হলো, তাতে ঘটলো ইতিহাসের জঘন্যতম মন্বন্তর যা পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে কুখ্যাত। সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে মেরে ফেলা হয়, যে ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল শাসক ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এবং তাদেরই উচ্ছিষ্ঠভোগী এদেশেরই এলিট ও লুটেরাবুর্জোয়াচক্র।

তো এই মন্বন্তরের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলিম একান্নবর্তী পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যেতে লাগলো, একসময়ের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারগুলোর উপর নেমে এলো চরম বিপর্যয়। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আকালের সময় স্ত্রী-কন্যাদের বেশীদিন ভরনপোষণ করতে অক্ষম হওয়ায়, একসময় ঐ হতভাগ্য নারীদের পথে বের হতে হয় কাজের সন্ধানে। তাদের কেউ শহরে এসে নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণী বা উচ্চবিত্তের মানুষের বাড়ীতে দাসীবৃত্তির কাজ নিল(এবং হয়তো খুব অনিবার্য কারণেই অনেককে গৃহকর্তার যৌনক্ষুধা মেটাতে হয়েছিল), কেউবা প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি এবং তাতে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাল। অবশ্য হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের যেসব রমনীগণ নৃত্য ও গীতবিদ্যা তথা ধ্রুপদী সংগীত শেখার সুযোগ বা সোভাগ্য লাভ করেছিল তারা বড়জোর বাঈজী হিসেবে

জীবন নির্বাহ করতে পেরেছে। তবে এদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে নগন্য। সত্যজিত রায়ের সাড়া জাগানো এবং জাতিয়-আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'অশনি সংকেত'-এ মন্বন্তর বা আকালের সময়ে মেয়েদের দুর্দশার জীবন্ত ও করুন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখা যায় কিভাবে এক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সুন্দরী ললনা পাড়ার অন্য মেয়েদের সংগে কিছুদিন পাশ্ববর্তী ডোবাগুলিতে বুকসমান পানিতে কচু, লতাপাতা এসব দিয়ে একবেলা অন্ন জোটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপর সেসবও যখন ফুরিয়ে গেল, এক পয়সাওয়ালা ভীষণদর্শণ এক ব্যবসায়ীর(নাকি মজুতদার-দানব ?) হাত ধরে শহরে পাড়ি জমাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও , যে লোকটি এতদিন তাঁকে প্রস্তাব দিয়ে আসছিল তার হাত ধরে পালানোর জন্য। না, কোন প্রেম-ভালবাসার বশবর্তী হয়ে নয়, ভদ্রঘরের ঐ মহিলাটিকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে বিয়ের নাম করে ভোগের জন্য। তারপর ঐ মহিলাটির কি পরিণতি হয়েছিল, বুদ্ধিমান পাঠক বা দর্শকদেরকে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। তখন ভদ্রঘরের অসংখ্য নারীর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল।

এবারে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন রাখতে চাই। উপরোক্ত এসব নারীদের সম্ভ্রম, মানমর্যাদা, পর্দা ও আব্রু তথা পারিবারিক খানদানীত্ব এবং শরীয়তি আদব যে রক্ষা হলোনা, বন্যার জলের মতো ভেসে গেল, তাঁর জন্য মূলত কি কারণ দায়ী ছিল ? উত্তর হতে পারে- ক) পরিবারের পুরুষদের অক্ষমতা ? খ) বিশ্বযুদ্ধোত্তর মরণদশাগ্রস্থ পূজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট তথা কালোবাজারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ? গ) স্বাধিনতা সংগ্রাম দমনের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার উদ্দ্যেশ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ? ঘ) তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারগুলোর মুসলিম নারীদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, পেশাগত দক্ষতা(যেমন-শিক্ষকতা, ডাক্তারী প্রভৃতি) বা যেকোন হাতের কাজ শিক্ষা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা-যা করা হতো খানদানী কৃষ্টি(সম্ভ্রান্ত শরীফ ঘরের আদব-কায়দা) এবং শরীয়তনির্দেশিত পর্দা প্রথার কঠোর প্রয়োগের দোহাই দিয়ে। ঙ) মুসলিম নারীর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে (শরীয়তসম্মত এক তৃতীয়াংশের হিস্যা থেকে) বঞ্চিত হওয়া ? কোনটি প্রধান কারণ ?

বিবেচকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, খ) ও গ)-এ বর্ণিত উত্তরটি পটভূমিগত কারণ, প্রত্যক্ষ কারণ নয় ? আমাদের দেখতে হবে যে প্রতিকূল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে, শরীয়ার নামে যে অনুশাসন ও কৃষ্টি বিরাজমান ছিল তা কালের পরিক্ষায় টেকসই কিনা, উত্তীর্ণ কিনা। কারণ শরীয়তি অনুশাসনকে অপরিবর্তনীয় বিধান হিসেবে মোল্লারা দাবী করে থাকেন, বিশেষ পরিস্থিতি এবং সমাজকাঠামোর ক্রমাগত বিবর্তনের বাস্তবতাটুকু বিবেচনায় না নিয়ে। উপুযুক্ত উত্তরটি সম্ভবত ঘ) ও ঙ)-এ বর্ণিত সম্মিলিত উত্তর। কথিত ঐসব ভাগ্যাহতা নারীর যদি শিক্ষা থাকত, হরেক রকমের হাতের কাজের কোন না কোনটি জানা থাকত, আর পিতার সম্পত্তির অংশ দিয়ে এবং হস্ত-দক্ষতা ব্যবহার করে ছোটখাট বিনিয়োগ করতে পারতো, তবে তাদেরকে মন্বন্তরের সময় ভিক্ষাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তিতে নামতে হতো না। কিন্তু মধ্যযুগীয় শরীয়তি সংস্কৃতি ছিল এর অন্তরায়। অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন যে, শরীয়তনির্দেশিত পিতৃসম্পত্তিতে নারীর এক তৃতিয়াংশের হিস্যা থেকে কেউ নারীকে বঞ্চিত করলে তার জন্য শরীয়ত দায়ী হবে কেন ? কারণ শরীয়তের মাধ্যমেই নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং বিবিধ পারিবারিক বিষয়ে পরিবারের কর্তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারকে অবদমিত রাখতে। আমি খুব সংক্ষেপে কোরানের কিছু আয়াত এবং বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

" যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্হিত করি এবং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনি ভালই জানেন"।-নাহ্ল ১০১। আয়াতটে ইঙ্গিত করছে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতিকে।

এবারে আসা যাক পরিবারে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রসঙ্গে। হানাফী আইন পৃঃ ১৩৮-১৩৯ থেকে-"বিয়েতে মেয়েরা অভিভাবক হতে পারবে না"।

"ব্যবসার দলিলে নারী-সাক্ষী পুরুষের অর্ধেক"-হানাফী আইন,৩৫২ পৃষ্ঠা ; শাফি'ই আইন-পৃঃ ৬৩৭(প্রত্যক্ষ সূত্র- banglarislam.com, হাসান মাহ্মুদ, টরন্টো, কানাডা)।

"প্রথম হইতেই নারীসাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য না হইবার কারণ হইল,- তাহাদের বুঝিবার কম ক্ষমতা, তাহাদের কম স্মরণশক্তি, ও তাহাদের কম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা "। -দি পেনাল ল' অফ ইসলাম-মোঃ ইকবাল সিদ্দীকি, কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর-পৃঃ ৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ১২৭ ও ১৪৯(প্রত্যক্ষ সূত্রঃ banglarislam.com ; আল্লার আইন-২, হাসান মাহমুদ)।

তাহলে, উপরোক্ত দলিল দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবেই স্বীকার করা হচ্ছে না, যাদের বোধশক্তি ও স্মরণশক্তির উপরই কোন ভরসা করা হয়নি, হেলায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেখানে পারিবারিক, সাংসারিক বা জাগতিক যে কোন বিষয়ে পরিবারের মধ্যে নারীর যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকবে না সেটা বলাই বাহুল্য । পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীদের এ অবস্থাই ছিল যার বিরুদ্ধে মহীয়সী বেগম রোকেয়া(এখন জামাতীরাও তাঁকে মহীয়সী বলেন, বলতে বাধ্য হন অনিচ্ছাসত্ত্বও) আজীবন আদর্শিক সংগ্রাম করেছন । এখন পরিবারে যখন নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতপ্রকাশের অধিকারই থাকে না, যার লাইসেন্স শরীয়াই দিয়ে দিয়েছে, সেখানে তাকে উত্তরাধিকার প্রশ্নে অবদমিত ও প্রভাবিত করে নিস্ক্রীয় করে রাখার পথটি সহজ নয় কি ? "যাদের বোধশক্তির অভাব রয়েছে, স্মরনশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অভাব রয়েছে, তারা সম্পত্তি নিয়ে কি করবে" ? "বিচারবুদ্ধি-স্মরণশক্তির অভাব থাকলে(শরীয়াপ্রদত্ত লাইসেন্স) তারা ত' সম্পত্তিকে কাজে লাগাতে পারবে না, বিনিয়োগও করতে পারবে না-অপচয়ই শুধু করবে"। এসব যুক্তি দিয়েই শরীয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে তৎকালীন মুসলিম পরিবারগুলোর পুরুষ সদস্যরা নারীদেরকে অবদমিত করে রাখতো । আর তার ফলাফল ছিল, মন্বন্তরের সময় একসময়ের পর্দানশীন নারীকে পতিতাবৃত্তি অথবা দাসীবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হওয়া । এই হলো গিয়ে শরীয়তি খানদানী(অর্থাৎ বনেদি) কৃষ্টির পরিণতি ।

ফতোয়াবাজির কারণে নারীদের আত্মহত্যা অথবা পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নেয়ার ব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যানের জন্যএকটা ব্যাপক সরেজমিন অনুসন্ধান হলে ভাল হয় । তবে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রের' মতো সংগঠনগুলোর কাছে অথবা জাতিসংঘের নারীসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসব পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া যেতে পারে ।

৫। স্বামীরা যদি শরীয়ার দোহাই দিয়ে একাধিক বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে নারীর সম্পত্তির হিস্যার গ্যারান্টি কে দেবে ? ফতোয়াবাজ মোল্লারা কি দেবেন ? শরিয়ত বা ইসলাম এর কি সমাধান দিচ্ছে ? তবে এওকি সত্য নয় যে, মোল্লাতন্ত্র চিরকালই পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন দিয়ে এসেছেন ?

৬। প্রায় দেখা যায়, পিতা হয়তো অন্য কোন যুবতী নারীকে বিয়ে করছে বিবাহযোগ্যা কন্যার উপস্থিতিতেই (গ্রাম্য সমাজে এখনো এধরণের ভুরি ভুরি ঘটনা দেখা যায়), তখন মা-মেয়ের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্গতি । আর যদি সেই সাথে একাধিক ছেলে সন্তান থাকে, তবে তথাকথিত শরীয়ত-নির্দেশিত, নারীদের জন্য পিতৃসম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের যে ফর্মূলা, তাঁর পরিণতিটা কি দাঁড়াচ্ছে ? সৎ মা, ভাইগণ এবং মায়ের(মায়ের দাবী অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত কারন, মায়েরা সংসারের পেছনে অনেক বেশী ঘাম ও রক্তজল করা অবদান রাখেন তিলে তিলে) হিস্যার পরে কন্যাসন্তানের ভাগ্যে কতটুকু সম্পত্তি জোটে ? যৎকিঞ্চিত নয় কি ?

৭) আর যদি, পিতা বা স্বামীর মৃত্যুর আগেই কন্যাসন্তানের মৃত্যু হয়(সংসারের জ্বালায় নিষ্পষিত হয়ে), তবে তো তাদের পিতার উত্তরাধিকার ভোগ করার সুযোগই থাকে না। সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি ? মৃত্যুতে কারো হাত নেই, এটা আল্লার ইচ্ছা এসব বলে কি দায় এড়ানো যাবে। যে নারীটি অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে মারা গেলো(যা অহরহ ঘটছে) তাঁর দায়ভার কে নেবে ? মোল্লারা, মুসলিম পারিবারিক আইন চর্চাকারী কোর্ট, নাকি তথাকথিত সংবিধানপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র বা সংবিধান ? সাম্প্রতি সংবিধানে নারীর সমানাধিকার সংক্ষরিত করে যে সমস্ত ধারা ৭২-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল এবং এখনো রয়েছে সে সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার কবীর তাঁর প্রবন্ধে('বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারীর অধিকার'-সূত্র দৈনিক জনকণ্ঠ) সেসব ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। সার্বজনীন মানবাধিকারের জাতিসঙ্ঘ ঘোষণা বা সনদ 'সিডো'-তে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিট ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষরকারী দেশ। এখন, কিছু গণবিরোধী মৌলবাদীর কথায় এই অঙ্গীকার থেকে সরে এলে বাংলাদেশ একটি অনুদার মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে সভ্য দেশগুলির কাছে পরিচিত হবে। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিকভাবে কতটা বৃদ্ধি পাবে তা' পাঠকদেরকে ভেবে দেখতে বলি। তাই, আপনাদের কাছে অনুরোধ, দেশে আপনারা যারা মসজিদে নিয়মিত যাচ্ছেন, মসজিদের উপর আপনাদের সবারই সমানভাবে হক রয়েছে-আপনারা মসজিদগুলিতে খোৎবার নামে বিতর্কিত ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত(ক্ষমতার লোভে) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানে প্রতিরোধ করুন, রক্ষণশীল স্বাধীনতাবিরোধী হিংস্র মৌলবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে ছেড়ে দেবেন না।

৮) বাংলাদেশের বহু পরিবার রয়েছে, যেখানে অকালে পিতাহারা হয়ে কন্যাসন্তানরা মামা-মামী অথবা কাকাকাকীর সংসারে বড় হয়। দেখা যায়, বাবার অনুপস্থিতির কারণে ভাইয়েরা সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যা থেকে বোনকে বঞ্চিত করছে। সম্পত্তি ও যৌতুকের লোভে বোনকে হয় কারো কাছে তাড়াহুড়ো করে গছানো হয় বিয়ে দেয়ার নাম করে অথবা মামা বা কাকার বাড়ীতে ফেলে রাখা হয় অভাবের অজুহাতে। আবার মামা-কাকার সংসারেও তাঁদের উপর চলে নানান লাঞ্চনা-গঞ্জনা। তো এইসব নারীরা যদি, পিতার জীবিতাবস্থায় পিতার কাছ থেকে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইনের রক্ষাকবচের মাধ্যমে সম্পত্তির ভাগ পেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হতো, তবে তাঁদের দুর্গতি হয়তো এতটা হতো না। শরীয়ত কি এধরণের বিশেষ পরিস্থিতির সমাধান দিয়েছে ?(আলেম-বিশেষজ্ঞদের কাছে উত্তর প্রত্যাশা করি)।

৯) ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের মনস্তত্ত্বে একটা আক্ষেপ ছিল যে হিন্দুরা সমস্ত উঁচু পদের সরকারী চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোর্ট-কাছারী সব দখল করে ফেলেছে-হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য করছে এবং করেছে('করেছে' বলছি-কারণ আজও বহু মুসলমান এই ধারণা পোষন করেন)। এই আক্ষেপ, বিদ্বেষ ও হীনমন্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ মৌদুদি ও কায়েদে আজমকে দিয়ে এবং আরো অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের উস্কে দিয়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ কারণে বারবার হোচট খেয়েছিল অনৈক্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে।

প্রশ্ন হলো, ক) এই যে দাঙ্গাকবলিত হয়ে অগণিত পিতা সন্তানহারা হলো, অসংখ্য মা পুত্রহারা হলো, অসংখ্য বধূ স্বামীহারা হলো; এত হাহাকার-ভোগান্তির জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ ? খ) এত ত্যাগের পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বারবার পিছিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ নাকি যে মূল কারণটি বা পটভূমিটি ইংরেজদেরকে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল সেটি ?

কারা দায়ী ছিল ? ইতিহাস সাক্ষী, এই মোল্লারাই তৎকালীন মুসলিম সমাজকে বুঝিয়েছিল, ফতোয়া দিয়েছিল যে বিধর্মীদের ভাষা শিক্ষা করা যাবে না। বিধর্মী ইংরেজের ভাষা শিখে মুসলমানরা ঈমাণ হারিয়ে ফেলবে, নাসারাদের ভাষা-কৃষ্টির প্রভাবে মুসলিমরা তাদের শত শত বছরের পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলবে। আর এভাবেই তখন মুসলমানদেরকে পঞ্চাশ বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয় শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে। বন্ধুগণ, এবার বিচার করুন, উপরের ক) ও খ)-এ বর্ণিত ট্রাজেডীর জন্য কারা দায়ী ? মোল্লারা নয় কি ? তাঁরাই ত' এত অগণিত দাঙ্গা ও রক্তপাতের কারণগুলো সৃষ্টি করেছিল। আজকের মোল্লারা কি তাদের হয়ে এই অসংশোধনযোগ্য ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবেন ?

আজ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায়' অর্থনীতি ও সম্পত্তিসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের প্রস্তাব(যেহেতু এটি এখনো আইন নয়, কিন্তু এর ভিত্তিতে আইন প্রনয়ণের সম্ভাবনা রয়েছে) করা হয়েছে, তখন ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা এর বিরুদ্ধে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে, তারা আমাদেরকে ভূতের মতো পেছন দিকে টেনে ধরতে চাইছে। চিরকালই দেশেবিদেশে তাদের একই প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দেড়শ-দুইশ বছর আগে যেভাবে মোল্লাতন্ত্রের কারণে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে গিয়েছিল, বহু অকল্যাণের ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল শুধু মুসলমানদেরই নয়, পুরো ভারতবর্ষকে, আজও তাদের প্রগতিবিরোধী, কল্যাণবিরোধী এবং শ্রেয়োঃবিরোধী ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি এতটুকুও, তাদের মনগড়া, বিকৃত নিজস্ব ইসলামের নামে, শরীয়তের নামে। চিরকালই এই গোষ্ঠীটি সভ্যতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, আধুনিকতার বিরুদ্ধে এবং কল্যাণ-প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, অচলায়তন সৃষ্টি করেছে।

এই মোল্লাতন্ত্র, ফতোয়াবাজি এবং শরীয়াতন্ত্রের কারণেই বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের তুলনায় শতবছর পিছিয়ে আছে আর ধুঁকে ধুঁকে মার খাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের ভূমিকা কি ছিল এদেশের মানুষের সেটা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এরা হচ্ছে অন্ধকারের শক্তি, তাই অন্ধকার ও অজ্ঞতা ছড়ানোই এদের কাজ। এদের কারণেই আজ সমাজে নারীর প্রতি এত সহিংসতা, এত এসিড-সন্ত্রাস, হত্যা প্রভৃতির মতো বর্বর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। কারণ, অনৈসলামিক শরীয়ার নামে(পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদরা শরীয়াকে ইসলামবিরোধী বলে রায় দিয়েছেন) এই মোল্লারা ধর্ষক ও ধর্ষিতাকে, নির্যাতক ও নির্যাতিতাকে একই শাস্তি দিয়ে অপরাধীদেরকে উৎসাহিত করেছে। এদের সালিশীর বিচার-প্রহসনের কারণে শত শত নারী হয় অপমানে-লজ্জায় হয় আত্নহত্যা করেছে, নয়তো ঘরবাড়ী-স্বামী সবকিছু হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে, নতুবা মৃত্যুবরন করেছে ঐ নূরানি চেহারার পিশাচগুলোর নিষ্ঠুর প্রস্তরাঘাতে। প্রিয় পাঠক, খুব বেশীদিন আগের ঘটনা নয়, এই একই চক্র(যে মৌলবাদী সংগঠনগুলো নারীর সম অধিকারসংক্রান্ত জাতীয় নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে), একই নরপিশাচরা জোট সরকারের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে, আপন কন্যার সামনে এক কাদিয়ানি মসজিদের ঈমামকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আহ্‌মদীয়াদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে লুণ্ঠনযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাদের পবিত্র মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিল, পবিত্র কোরাণশরীফে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, প্রার্থণারত অবস্থায় বর্বর হামলা চালিয়ে আহত করেছিল মুসল্লীদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙ্গালী বড় বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি !

জামাত ও তার সমগোত্রীয় কিছু মৌলবাদী, ধর্মব্যবসায়ী ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল আজ ইসলাম ও তথাকথিত আল্লাহ্‌র আইন(?) রক্ষার নামে শান্তিপ্রিয় মুসল্লীদেরকে ব্যবহার করতে চাইছে। কিন্তু কোন্ ইসলাম ? হানাহানি ও ফিত্‌না সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ইসলাম নয় কি ? সেটা

তাদের ইসলাম হতে পারে । প্রিয় পাঠক, আমাদের ইসলাম হলো সুফীসাধকদের উদার ও সমাহিত শান্তির ইসলাম । তলোয়ারের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম কায়েম হয়নি, হয়েছিল সূফী-দরবেশদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে, তাঁদের সহনশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, ভালবাসা, আধ্যাত্মিকতা, মরমী ভাবরস ও ন্যায়পরায়ণতার প্রভাবে(আজকের মৌলবাদীদের মধ্যে যার লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না),-হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে নয় । ইতিহাস সাক্ষী, সূফী মনসূর হাল্লাজের মতো সিদ্ধ সাধককে তাঁর সময়ের রক্ষণশীল অসহিষ্ণু শরীয়াপন্থী মোল্লারাই প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেছিল খোদাদ্রোহী আখ্যা দিয়ে । সব যুগেই এদের ভূমিকা একই রকম । মতের মিল না হলেই একদল আলেম বা মৌলানা অন্যদল মৌলানাকে মুরতাদ আখ্যা দিচ্ছেন যা সম্পূর্ণভাবে কোরাণের ও রসূলুল্লাহ্‌র নির্দশের বরখেলাপ ।

তো যা বলছিলাম, বাংলাদেশের এইসব ধর্মব্যবসায়ীদের অপতৎপরতার আসল উদ্দ্যেশ্য হলো, একটা কিছু ইস্যু করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা এবং প্রান্তিক সাংগঠনিক অবস্থা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে ক্ষমতার আস্বাদগ্রহণ এবং কায়েমীস্বার্থের ভাগীদার হওয়া । অন্য কথায়, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো 'Theocracy' (যাজকসম্প্রদায় বা ধর্মনেতাদের দ্বারা পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাঠামো) প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ মোল্লাতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়া । এসব অশুভ আলামত । এসবের যে কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, ইউরোপের যাজকতন্ত্রের বর্বর, উৎপীড়নমূলক ও রক্তক্ষয়ী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি । আমাদের ভারতবর্ষে, রাজা বল্লাল সেনের সময়, পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় বর্বরতা, শোষণ-দূর্নীতি ও অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন । একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের মৌলিক ইস্যুগুলি যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দ্রব্যমূল্য, দারিদ্র্য, বিদেশী ও তাদের এদেশীয় এলিট-দোসরদের কাছ থেকে খনিজসম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার, পরিবেশরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে কখনোই এই মৌলবাদীদের কখনো আন্দোলন করতে দেখা যায়নি । শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সারের দাবীর মতো ইস্যুগুলিতে কোনদিনই এই গোষ্ঠীর নেতাদের কারো একটি বিবৃতি বা নিবন্ধ আমরা পত্রিকায় দেখিনি , আন্দোলন তো দূরে থাক । আজ যখন উত্তরবঙ্গে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষেরা দিশেহারা, নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে সরকারের নানান লুকোচুরিতে দেশের মানুষ সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন , ঠিক সেই সময়টিকেই কথিত ঐসব গণবিচ্ছন্ন মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি, এমন একটি মতলবী ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে মাঠ গরম করতে চাইছে । সাধারণ মানুষের জ়ীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা তো নেই-ই, বরং এসব থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানোর কায়েমীস্বার্থবাদী চেষ্টাই এর মূল উদ্দ্যেশ্য বলে মনে হয় । সব সরকারের সময়ই, শাসকদের কাছ থেকে ভোল পালটে করুণাভিক্ষা ও নানাভাবে স্বার্থহাসিল করতে এই গোষ্ঠী অতিশয় পারদর্শী । তাই এদেরকে অত্যন্ত ধূর্ত ও শঠও বলা যায় । এইসব মৌলবাদী দলগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা বলেই সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই, এদের গঠনতন্ত্রের মধ্যেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি তথাকথিত 'আল্লার একচ্ছত্র অধিকারের' নামে । অথচ খেলাফতের সময়ও(এজীদের পূর্ব পর্যন্ত) তখনকার সময়ের উপযোগী প্রাথমিক ধাঁচের নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ।

প্রিয় পাঠক, উপরে চিত্রিত পৈশাচিকতা, হিংস্রতা, বর্বরতা, কপটতা, সুবিধাবাদিতা , সংকীর্ণ কায়েমী স্বার্থ-ইত্যাদিই হলো গিয়ে, মৌলবাদীদের ও মোল্লাতন্ত্রের আসল চেহারা । এদের পাপের কোন সীমা-পরিসীমা নেই । এদের কারণেই নারীসমাজের এত হাহাকার, এত দুঃখ, এত দীর্ঘশ্বাস । এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের ব্যবসা ও সম্পত্তি লুণ্ঠন, গ্রেনেড বিস্ফোরণ করে অগণিত নিরীহ মানুষ হত্যা । এই ভন্ডরাই নাকি মোনাজাতের মধ্যে দোয়া করে, 'সমস্ত মুসলমানকে আল্লা যেন সুখে-শান্তিতে রাখে, হেফাজত করে' । কিন্তু এরাই মানুষের জীবনকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলছে । হিলার নামে স্ত্রীকে

যদি অন্যের ঘরে দেয়া হয়, তাতে শুধু ঐ নারীই মানসিক নিপীড়নের শিকার হয় না, স্বামীকেও মানসিক যন্ত্রণা পোহাতে হয়। একজন অশিক্ষিত স্বামী সাময়িক রাগ বা খেয়ালের বশে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করতেই পারে-এটা সংসারের স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু, আল্লা ত' মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করে যান, তাহলে মোল্লাদের এসব ভূমিকা কি খোদার কাজের সহায়ক ? তাহলে কিভাবে আল্লা মুসলমানদের(বিধর্মীদের কথা বাদই দিলাম-তাদের কথা আল্লা ভাববেন) শান্তিতে রাখবেন ?

অতএব, এসব ধর্মব্যবসায়ী চক্র 'ইসলাম গেল গেল' রব তুলে নারী-অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি এবং দুর্বলতাকে পূজি করে কিছুদিনের হুজুগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবে-এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং এটাই প্রত্যাশিত। এসব মতলববাজদের ব্যাপারে জনগনকে সতর্ক থাকতে হবে, তাতেই তাঁদের ঈমাণ ও দেশপ্রেম উভয়ই রক্ষা পাবে।
কারণ আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (-আল্ কোরান)।

পরিশেষে, নজরুলের 'পাপ' কবিতার দুটি লাইন দিয়ে লেখা শেষ করছি-

"ধর্মান্ধরা শোন,
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজের পাপ গোনো।"